*Jagannath University Journal of Social Sciences, Vol. 3, No. 1-2, 2015, pp. 111-122*

# পার্বত্য চট্টগ্রামের তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের পেশাগত পরিবর্তন ও গতিশীলতা : একটি নৃবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা

***সুমন কুমার মজুমদার***
প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

***Abstract:*** *This paper concerns about the occupational change and mobility among Tanchangya community in Chittagong Hill Tracts (CHT), an indigenous community with significant cultural differentiation from the mainstream Bengali population. Dealing with the issues of their livelihood and quest for identity, the article explores how their ethnicity and livelihood are interlinked to a particular environment, and how that has been changing over time. This has been examined in the context of state policies towards non-Bengali ethnic minorities in the CHT in general, and among Tanchangya community in particular. Traditionally Tanchangyas were jhum cultivators but over the years in the face of population growth, shortage of jhum land and various forces of market economy forced Tanchangy people to adapt a changing environment which includes occupations like plough agriculture, jobs, business and so on. As consequence, their occupational changes are taking place so their life and livelihood are in chaging mode. More importantly though the jhum cultivation has no longer been the mainstay of their livelihood rather it has become cultural symbol of their tradition. The paper addresses these issues based on firsthand ethnographic fieldwork among the Tanchangya in the CHT.*

## ভূমিকা

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও এথনো-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর পেশাগত পরিবর্তন ও গতিশীলতার স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের বসবাস প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক বৈচিত্র্যসহ নানা বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে স্বতন্ত্র এবং এই অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জনগোষ্ঠীসমূহকে সামষ্টিকভাবে 'উপজাতি', 'আদিবাসী', 'নৃগোষ্ঠী', 'পাহাড়ি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা' নানা নামে ডাকা হয়ে থাকে। গবেষক ও অন্যান্যদের মাঝে এ নিয়ে নানা বির্তক থাকলেও এই সব জনগোষ্ঠী যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহৎ পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করে তারা নিজেদেরকে পাহাড়ি বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে (আহামেদ ২০১২)। তাই এ প্রবন্ধে এদেরকে সম্মিলিতভাবে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেছি। ভৌগলিক দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ–পূর্ব কোণে ভারত ও মিয়ানমার সীমান্ত ঘিরে একটি বিস্তৃত পাহাড়ি অঞ্চল। এখানে যে এগারটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বসবাস করে তারা হলো: চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, খুমি, চাক, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসাই, খ্যাং, এবং পাংখোয়া। এদের প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীই কোন না কোনভাবে অতীতে জুমচাষের সাথে যুক্ত ছিল বা এখনো আছে। এথনো-ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে এই জনগোষ্ঠীগুলোর প্রত্যেকটির আবির্ভাব, অস্তিত্ব ও বিস্তৃতির ইতিহাস ভিন্ন ধরনের (মহসীন ১৯৯৭; খান ২০০৭; সাত্তার ১৯৮৩)। প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠন, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, রীতিনীতি, জীবন-পদ্ধতি প্রভৃতি বহুমাত্রিকভাবে স্বতন্ত্র ধরনের। আবার এই বহুমাত্রিকতাই এক ধরনের সামষ্টিক আত্মপরিচয়ের মাত্রা তৈরী করে বলে ধারণা করা হয় (আহামেদ ২০০৬)। এখানে একদিকে যেমন তাদের প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল, অন্যদিকে তারা স্থানীয়–জাতীয় রাজনীতির সাথেও সম্পৃক্ত।

১৯৯৭ সালে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামে তঞ্চঙ্গ্যাসহ অন্যান্য পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাথে বৃহত্তর বাঙালি সমাজের অনেকাংশে আন্তঃসম্প্রদায়গত যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের সামগ্রিক জীবন যাত্রায়ও এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাঙালি সংস্কৃতির অনেক কিছু যেমন, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা অর্জন ও স্থানান্তরের মনোবৃত্তি ক্রমাগতভাবে আত্মীকরণের ফলে তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা, ভাষাসহ নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। তঞ্চঙ্গ্যাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা এখন আগের মত পুরোপুরি জুমচাষ নির্ভর নয়, তাদের মাঝে একদিকে যেমন ঐতিহ্যবাহী পেশা হস্তশিল্প, পশুপালন, বস্ত্রবয়ন, শিকার প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে তেমনিভাবে বর্তমানে তারা আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি কাজ, শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে চাকুরি বা জীবিকা গ্রহণ, ব্যবসা ও শ্রম নির্ভর নানা পেশার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। তথাপি জুমচাষকে এখনো তাদের ঐতিহ্যের শিকড় হিসাবে অভিহিত করে থাকে। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় তঞ্চঙ্গ্যাদের পেশাগত পরিবর্তন ও গতিশীলতার বিষয়টিকে উপজীব্য করে এই প্রবন্ধে তার স্বরূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে।

## গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে এই গবেষণা কর্মটির মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের এথনো-ঐতিহাসিক, আর্থ–সামাজিক ও পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিক্রমায় তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের পেশাগত পরিবর্তন ও গতিশীলতার স্বরূপ উদঘাটন করা। তবে সুনির্দিষ্ট এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিছু গবেষণা প্রশ্নের মাধ্যমে পুরো বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলো হলো :

- কখন থেকে এবং কীভাবে তঞ্চঙ্গ্যাদের মাঝে পেশাগত পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়?
- জুমচাষের পাশাপাশি তারা অন্য আর কোন কোন পেশার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং এই পেশাগত পরিবর্তনের ব্যাপারে তঞ্চঙ্গ্যাদের মনোভাব কী?
- পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় প্রথাগত রাজনীতিতে তঞ্চঙ্গ্যাদের অবস্থান এবং জাতীয় রাজনীতির সাথে তাদের সম্পৃক্ততা পেশাগত পরিবর্তন ও গতিশীলতার ক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করছে?
- তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে পেশাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারী–পুরুষের অবস্থান কী ধরনের?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর পেশাগত পরিবর্তন ও গতিশীলতার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করেছি। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ক্রম পরিবর্তনশীল ধারায় এ গবেষণা কর্মটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তি উত্তর সময় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অভ্যন্তরীণভাবে যে 'আপেক্ষিক স্থিতাবস্থা' বিরাজ করছে তার ফলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে শুধুমাত্র সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে তা নয় বরং এন.জি.ও., আর্ন্তজাতিক সাহায্য সংস্থাসহ নানা সংগঠনের উপস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবন ধারায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পরিবর্তনের এ ধারা তঞ্চঙ্গ্যাসহ অন্যান্য পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে কেবল মাত্র বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করছে তা নয়, বর্তমান সময়ের অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গেও যুক্ত করছে। বর্তমানে তারা আধুনিক শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষিত হচ্ছে, নিজ গ্রামের সীমানা পেরিয়ে অন্য সম্প্রদায় কিংবা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে মেলামেশা করছে। ফলে এক দিকে যেমন প্রভাবশালী বাঙালি সংস্কৃতি ও বৈশ্বিক নানা বিষয়ে তারা আজ প্রভাবিত হচ্ছে, তেমনিভাবে অনেকে স্বীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী নানা বিষয়কে পাশ কাটিয়ে অন্য সংস্কৃতির নতুন বিষয়কে অবলীলায় গ্রহণ করছে। পেশা পরিবর্তন বা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ এ পরিবর্তন ধারার অন্যতম একটি অংশ। অর্থাৎ যে প্রশ্নটি আমাকে এ গবেষণায় অধিকতর আগ্রহী করে তুলেছে তা হলো, তঞ্চঙ্গ্যারা কি বর্তমানে নিজেদের প্রয়োজনেই তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশার পরিবর্তে নানা ধরনের নতুন নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হচ্ছে? বাস্তবিক পক্ষে শুধু পেশাই নয়, জ্ঞাতি সম্পর্ক, চাষাবাদ, রাজনৈতিক ব্যবস্থাসহ নানা বিষয়ে এক ধরনের পরিবর্তন ও গতিশীলতার আর্বিভাব ঘটেছে। পরিবর্তনের এই বিষয়গুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক লেখালেখিতে

সেভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি। তাই আমি মনে করি, এ প্রেক্ষাপটে আমার গবেষণা কর্মটি নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা যৌক্তিকতা প্রদান করবে।

## সাহিত্য পর্যালোচনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতার প্রেক্ষিতে যে বিষয়টি পরিষ্কার হলো তা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে ঐতিহ্যের অন্বেষণ নয় বরং পরিবর্তিত সময়ের সাথে তাদের পেশাগত জীবনে এক ধরনের গতিশীল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাত্ত্বিকভাবে এ পেশাগত পরিবর্তন এবং গতিশীলতাকে আমরা কীভাবে বুঝতে চাই। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জনের জন্য কয়েকটি সংজ্ঞা আলোচনা করা যায়। সমাজবিজ্ঞানী ড্রেসলার এর মতে "Social mobility is the movement of individuals from one stratum to another" (Dressler, 1969: 397)। অন্যদিকে সামাজিক গতিশীলতা সংক্রান্ত আলোচনায় সরোকিন বলেন, "Social mobility is a process of transition of an individul . . . which has been created or modified by human activity from one social position to another" (Sorokin, 1964: 25)। এ আলোচনা হতে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, গতিশীলতা হলো ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ধারা যেমন: সামাজিক অবস্থান, পদ, মর্যাদা ও পেশা। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, সামাজিক গতিশীলতা সকল সমাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বলা যায়, সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির ধরন এবং প্রকৃতির উপর এই গতিশীলতা নির্ভর করে। সামাজিক অবস্থা বা কাঠামো যদি অপরিবর্তিত থাকে সেক্ষেত্রে গতিশীলতার হার কম হতে বাধ্য আবার এই অবস্থা ঠিক বিপরীতমুখী হয় মুক্ত ও পরিবর্তনশীল সমাজে, সেখানে গতিশীলতার হার বৃদ্ধি পায়। আধুনিক প্রযুক্তি, শিক্ষা, রাজনৈতিক সংস্কার, যোগাযোগসহ নানা কারণে সমাজ অনেকাংশে পরিবর্তিত হয় এবং গতিশীলতা লাভ করে। তবে এসব নানা কারণের মধ্যে সমাজে পেশার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান যে সকল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয় পেশা এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত ক্লাসিক্যাল এবং সমসাময়িক রচনাবলীর দিকে যদি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পেশাগত বৈশিষ্ট্যসহ নানা বিষয়ের একটি ধারণা পাই। ক্যাপ্টেন টি.এইচ.লুইন (১৮৬৯) তাঁর The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীসমূহের সাধারণ রীতিনীতি, ধর্ম, উৎসবাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ, সঙ্গীত, পৌরাণিক কাহিনীসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থটিতে বিশেষভাবে চাকমা জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বিকাশ, ভাষা, প্রেম-ভালবাসা, বিবাহ, শেষকৃত্য প্রভৃতি সংক্রান্ত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে, তবে এর শেষ অংশে ত্রিপুরা, খুমি, ম্রো, খ্যাং, বনযোগী, পাংখুয়া, লুসাই, সেন্দুজ প্রভৃতি পাহাড়ি গোষ্ঠীসমূহের জীবন প্রণালী, অভ্যাস ও রীতিনীতি সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হয়েছে। এই বিবরণীতে তিনি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা 'জুম' এর উল্লেখ করলেও এর পরিবর্তনশীলতার কথা উল্লেখ করেননি।

Pierre Bassaignet (১৯৫৮) এর Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিচিতি, তাদের অর্থনৈতিক জীবনধারা, তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর গ্রন্থে একটি তঞ্চঙ্গ্যা গ্রাম ও দুটি মগ গ্রামের বর্ণনা রয়েছে। পাশাপাশি একটি ম্রো পরিবার ও চাকমাদের বাল্যজীবন সম্পর্কিত বর্ণনাও রয়েছে এতে। তাঁর গ্রন্থে তঞ্চঙ্গ্যাদের চাকমা জনগোষ্ঠীর একটি শাখা হিসাবে উল্লেখ করা হলেও তাদের পেশাগত গতিশীলতা বা পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন মন্তব্য পাওয়া যায় না।

সাম্প্রতিক কালে আমেনা মহসীন (১৯৯৭) তাঁর The Politics of Nationalism: The case of the Chittagong Hill Tracts Bangladesh গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সময়কালে পাহাড়ি-বাঙালি জাতি ভিত্তিক রাজনীতির যে প্রেক্ষাপট তৈরী হয় তার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র থেকে শুরু করে উত্তর-ঔপনিবেশিক স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো পর্যন্ত পাহাড়ি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কী ধরনের নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষভাবে উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচী, তিনি তা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। পাহাড়ি 'জাতীয়তাবাদ' এর উত্থান ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এর প্রভাব সম্পর্কে তিনি তাঁর গ্রন্থে ধারণা দিয়েছেন বটে কিন্তু বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর পেশাগত পরিবর্তনশীলতা নিয়ে তেমন কোন আলোচনা এতে নেই।

শেলী (১৯৯২) তাঁর The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Untold Story নামক গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ভৌগলিক অবস্থা, অর্থনীতি, জনসংখ্যা, সাম্প্রতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বিশদ ভাবে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন ও এর গুরুত্ব এবং প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করলেও নৃগোষ্ঠীর পেশা পরিবর্তন, এর গতিশীলতা বা রাজনৈতিক-অর্থনীতি নিয়ে তেমন কোন আলোচনা করেননি।

রূপক দেবনাথ (২০০৮) তাঁর Ethnographic Study of Tanchangya of CHT, CADC, Sittwe and South Tripura গ্রন্থে বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এককভাবে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় নিয়ে বলা যেতে পারে এটাই প্রথম কোন এথনো-ঐতিহাসিক কাজ। তিনি তাঁর গ্রন্থে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব, বিকাশ, অভিবাসন, ভাষা, বস্তুগত সংস্কৃতি, পরিবার, আত্মীয়তার সম্পর্ক, বিশ্বাস, আচার-প্রথা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। রূপক দেবনাথই সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট ভাবে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় নিয়ে কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের সামগ্রিক দিক পর্যালোচনা করে একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তবে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের পেশাগত অবস্থান কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা তাঁর আলোচনায় তেমনভাবে উঠে আসেনি। তাই এ গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের তঞ্চঙ্গ্যাদের পেশাগত গতিশীলতার একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো থাকা অপরিহার্য। তাত্ত্বিক কাঠামোর সাহায্যে গবেষণার বিষয়বস্তু অনুধাবন সহজতর হয়। তাছাড়া প্রাপ্ত তথ্যকে অর্থপূর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রে তত্ত্বের প্রায়োগিক বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাই বিষয় ও উদ্দেশ্যের বিবেচনায় এ গবেষণা কর্মটিকে আমি 'Anthropology of Community Studies' ধারণা এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে তঞ্চঙ্গ্যাদের পেশাগত গতিশীলতা বিশ্লেষণের প্রয়োজনবোধ করেছি। একটি সম্প্রদায় কিভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় তা Anna Tsing (১৯৯৮) তাঁর In The Realm of Diamond Queeens: Marginality in an out-of-the way place নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, একটি জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়া তিনটি দিক হতে উপলব্ধি করা যায়; এলাকার এথনো-ইতিহাস (Ethno-History of the region), রাষ্ট্রের প্রান্তিকীকরণের রাজনীতি (Politics of marginality of the state) ও উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ হতে সামাজিকভাবে বর্জন (Social exclusion in development initiative)।

Anna Tsing এর উল্লেখিত প্রান্তিকীকরণের যে কাঠামো তা বিবেচনা করে বলা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়সহ অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর এথনো-ইতিহাস এক রকম দ্বন্দ্ব সংঘাতময়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসকের আমলে এ এলাকার ইতিহাস ছিলো পাহাড়িদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের ইতিহাস। তাছাড়া রাষ্ট্রীয়ভাবে এ অঞ্চলে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বাঙালি অনুপ্রবেশ ও পাহাড়িদের ভূমি দখলসহ নানা পদক্ষেপের কারণে এখানকার পাহাড়ি গোষ্ঠীসমূহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে, যা বিভিন্ন গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে

(মহসীন ১৯৯৭; দেবনাথ ২০০৮; শেলী ১৯৯২)। উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ থাকলেও তঞ্চঙ্গ্যাদের উপস্থিতি এখনো নগণ্য বা এক্ষেত্রে তাদেরকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশে যে ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয় তা হতে এখানে ভিন্ন ধরনের অবস্থা দৃষ্ট হয়, উন্নয়ন কর্মসূচীগুলোতে স্থানীয় প্রত্যাশার প্রতিফলন দেখা যায় না। তাই এ গবেষণায় প্রান্তিকতাকে কেন্দ্র করে তঞ্চঙ্গ্যাদের পেশার গতিশীলতাকে উপস্থাপনই কার্যকরভাবে আমি এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করার প্রয়োজনবোধ করছি। আমি মনে করি Anna Tsing এর তাত্ত্বিক ধারণাটি প্রান্তিকতাকে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়তা করলেও পেশার গতিশীলতা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উপাদান কতটুকু কার্যকর হবে সেটা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। আমি মনে করি তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হয়েছে সেগুলো তুলে ধরা প্রয়োজন। সেই পরিবর্তন কোন প্রক্রিয়ায়, কীভাবে এবং কেন সংঘটিত হচ্ছে বা হয়েছে তা ব্যাখ্যার দাবী রাখে। এ প্রবন্ধটির মাধ্যমে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় আধুনিকতা, সাংস্কৃতিক আধিপত্য, বিশ্বায়ন, পুঁজিবাদ প্রভৃতি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত। ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনেও নানা ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আবার এ বিষয়গুলো পরস্পর আন্তঃসম্পর্কিত। তাদের এ পরিবর্তনের সাথে প্রতিবেশগত অভিযোজনের বিষয়টিও সম্পৃক্ত বিধায় উল্লেখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন।

## গবেষণা পদ্ধতি

নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে বান্দরবান সদর উপজেলার রেইছা সাতকমল পাড়ায়, যা বান্দরবান সদর হতে ৮ কি. মি. দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের তঞ্চঙ্গ্যারা কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসা, শিক্ষকতা, সরকারি-বেসরকারি চাকুরিসহ নানা পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। তাই পেশাগত পরিবর্তন ও গতিশীলতা অনুধাবনের জন্য এ গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে দৈব চয়ন নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে উপাত্তদাতা নির্বাচন করা হয় এবং তাদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে উপাত্তদাতারা মুক্তভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং পূর্ণাঙ্গ মতামত প্রকাশ করতে পারে। এর পাশাপাশি প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সাতকমল পাড়ায় আটাশ দিন অবস্থানকালে তাদের আড্ডা, খেলাধুলা, অনাথালয়ে শিক্ষাদান, কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যা এ গবেষণায় সংগৃহীত উপাত্তকে অধিকতর সঠিক ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। পেশা, রাজনীতি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক নির্ধারক সম্পর্কে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। অধিকন্তু, উপাত্তের বিস্তৃতি ও গভীরতার জন্য মাঠকর্ম সম্পাদনে ৪(+) জন প্রধান তথ্যদাতার সহায়তা নেয়া হয়। গবেষণার মূল উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে কিছু কেস স্টাডি করা হয়েছে এর মাধ্যমে তাদের পেশা, শিক্ষা, রাজনীতি, আন্তঃসম্পর্ক প্রভৃতির প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহাসিক পটভূমি, গ্রামের পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা, অন্যান্য পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বিশেষত চাকমা ও মারমাদের সাথে তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা জন্য জীবন বৃত্তান্ত পদ্ধতিটির কার্যকর প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে।

## তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের এথনো-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রথম বসতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় মাতামুহুরী নদীর উপনদী তৈনছড়ি এর আশেপাশের এলাকাকে। তৈনছড়ি এলাকা থেকে আগত বলে চাকমা রাজ সরকারের জুম তৌজিতে তাদেরকে তৈন্টংগ্যা নামে তৈজিভুক্ত করা হয়, এই তৈন্টংগ্যা শব্দটি ক্রমে ক্রমে তঞ্চঙ্গ্যা লিখিত রূপ লাভ করে

(তঞ্চঙ্গ্যা ১৯৯৫: ৫)। জনসংখ্যার বিবেচনায় তঞ্চঙ্গ্যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে চতুর্থ বৃহৎ জনগোষ্ঠী (তঞ্চঙ্গ্যা ১৯৯৫)। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত এই সম্প্রদায়ের সকল সদস্যই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, তবে বৌদ্ধ হলেও সনাতন প্রথা মতে এদের অনেকে গাঙ পূজা, চুমুলাং পূজা, সিন্নি পূজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান পালন করে থাকে। তাদের বৌদ্ধ আত্মপরিচয়ের পাশাপাশি তঞ্চঙ্গ্যা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম দিক হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী পোশাক। মাথায় খবং (খোঁপা বেষ্টনী) বাঁধা, ফুলহাতা কোবোই (ব্লাউজের মতো শরীরের উপরের অংশের আচ্ছাদনী), সাদা কোমর বন্ধনী, সাতরঙা পিনুইন (শরীরের নিচের অংশের আচ্ছাদনী) এবং রূপার তৈরী অলংকার বাঘোর (কব্জিতে), তাজজুর (বাহুতে), চন্দ্রহার (গলায়) প্রভৃতি পরিহিত তঞ্চঙ্গ্যা নারী কিংবা সাদা রঙের ধুতি ও লম্বাহাতা জামা পরিহিত তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষদের সহজেই অন্য পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসমূহ থেকে আলাদা করা যায়। ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় গোত্রকে 'গছা' ও গোষ্ঠীকে 'গুত্তি' বলা হয়। তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সর্বমোট ১২টি গছা আছে, যার মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টা গছার লোক বসবাস করে (তঞ্চঙ্গ্যা ১৯৯৫: ২৯)। গবেষণা এলাকায় ৩টি গছার লোকের বসবাস রয়েছে, এগুলো হচ্ছে মো গছা, মংলা গছা ও লাং গছা। মো গছার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তাশি গুত্তি, আগারা গুত্তি, খুস্বা গুত্তি, দাল্লোরা গুত্তি ও গুণ্যা গুত্তির লোক রয়েছে। আর মংলা গছার মধ্যে দারণ্যা গুত্তি ও লাং গছার মধ্যে লাম্বায়া গুত্তির লোক রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক তঞ্চঙ্গ্যাদের অধিকাংশই শুধুমাত্র জুম চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল, বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যাগণ মূলতঃ কৃষিজীবি, তবে অনেকেই চাকুরি, ব্যবসাসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডেও যুক্ত।

## তঞ্চঙ্গ্যাদের পরিবর্তনশীল পরিবার কাঠামো

তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের সদস্যরা একে অপরের সাথে সামাজিক এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের জালে আবদ্ধ। এই জনগোষ্ঠী একটি সাধারণ ঐতিহ্য, প্রথা ও জীবন প্রণালী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক সাথে বসবাস করে আসলেও এখন তাতে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ফলতঃ তাদের মধ্যে এক ধরনের ইতিবাচক মানসিকতাও সৃষ্টি হয়েছে যা তাদের পারস্পরিক প্রয়োজনে একে অপরের সান্নিধ্যে আসার ক্ষেত্র তৈরি করছে।

তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের মাঝে বর্তমানে একক পরিবারের সংখ্যাই বেশী, ঐতিহ্যবাহী যৌথ ও বর্ধিত পরিবারের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। দুটি পাহাড়কে আশ্রয় করে গড়ে উঠা রেইছা সাতকমল পাড়ায় বর্তমানে ১০৫-১১৫ টি তঞ্চঙ্গ্যা, ৩ টি চাকমা ও ১টি মারমা পরিবার রয়েছে, তবে তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারগুলোর মধ্যে একক পরিবারের সংখ্যাই সর্বাধিক। গবেষণাধীন চব্বিশটি পরিবারের মধ্যে ষোলটি একক পরিবার, পাঁচটি যৌথ পরিবার এবং তিনটি বর্ধিত পরিবার অর্থাৎ প্রায় তিন-চতুর্থাংশই হলো একক পরিবার। তবে পূর্বে যৌথ ও বর্ধিত পরিবারের সংখ্যা বেশী থাকলেও সময়ের পরিক্রমায় একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূলত জুম চাষ ও কৃষির জমি কমে যাওয়া, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কারণে পরিবারের গঠন প্রণালীতে এ ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পূর্বে তারা চাষাবাদ ও সংগ্রহের মাধ্যমে অধিকাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা মেটাতো কিন্তু জীবন ধারণের জন্য এখন অন্যান্য পেশা অবলম্বন হিসাবে বেছে নিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একজন প্রধান তথ্যদাতা বলেন "আগেতো তঞ্চঙ্গ্যারা পাহাড়ের বন জঙ্গল হতে লতা-পাতা, ফল-মূল, লাকড়িসহ প্রয়োজনীয় সব খুঁজে নিত কিন্তু এখন মানুষ বেশিরভাগ প্রয়োজন মেটাচ্ছে বাজার থেকে"।

তাছাড়া এ পরিবর্তন ধারার প্রভাবে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী পরিবার কাঠামো বন্ধনে বিশেষ করে বাবা মায়ের সাথে তাদের বিবাহিত সন্তানসন্ততির সম্পর্কের মধ্যে এক ধরনের শিথিলতা লক্ষ করা যায়। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই নবদম্পতি পিতামাতার সঙ্গে থাকার পরিবর্তে একক পরিবার গঠন করে। এ বিষয়ে একজন তথ্যদাতা অভিমত দেন যে, 'ইদানীং দেখা যাচ্ছে যারা নতুন বিয়ে করছে, কিছু দিন পার হওয়ার পরে তারা বাবা মায়ের সাথে থাকতে চায় না, এজন্য বাবা মায়ের সাথে বিবাহিত ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক গুলো হালকা হয়ে যাচ্ছে'। তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে বিয়ে পরবর্তী পরিবার কাঠামোতে বর্তমানে একক পরিবার গঠন কেন্দ্রিক প্রবণতা লক্ষণীয়। বয়োজ্যেষ্ঠ সাতকমল তঞ্চঙ্গ্যা, যিনি প্রথম স্ত্রীর পরলোক গমনে দ্বিতীয় বিয়ের

পর আগের সন্তানসন্ততির সাথে বসবাস না করে অন্যত্র বসতি স্থাপন করেছেন, তার সকল সন্তান ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে একটি দোকান পরিচালনার মধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তঞ্চঙ্গ্যাদের এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে স্থানীয়ভাবে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যা তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায়– 'এককুয়্যা শিলত তলে এককুয়্যা কাঙা' অর্থাৎ কাঁকড়ারা সাধারণত একটা পাথরের নিচে একাই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এ প্রবণতা তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সম্প্রতি পারিবারিক গঠন সংক্রান্ত পরিবর্তনশীল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে মনে করা যেতে পারে। প্রচলিত এই ধারাবাহিকতায় ক্রমবর্ধমান হারে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে যৌথ ও বর্ধিত পরিবারের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে তাদের প্রথাগত জুম চাষের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কারণ জুমচাষ একটি শ্রমঘন উৎপাদন ব্যাবস্থা, যেখানে অনেক লোকের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন হয়। একক পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম থাকায় জুমচাষ তাদের নিকট সমস্যাজনক জীবিকা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাই জীবন ধারণের জন্য তারা প্রতিনিয়ত অন্যান্য পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করছে। পেশাগত পরিবর্তন তাই তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া হিসাবে প্রতিভাত হয়।

## প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত মানসিকতা পরিবর্তন

পূর্বে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের মাঝে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের হার খুবই কম ছিল। হাতে গোনা যায় এরূপ গুটিকয়েক তঞ্চঙ্গ্যা তখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ করতে সক্ষম হতো, তাছাড়া সে সময় স্কুল–কলেজের সংখ্যা সীমিত ছিল। বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও এটি জাতীয় হারের তুলনায় অনেক কম। অতীতে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে শিক্ষার নিম্নহার পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে বহুলাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষাগ্রহণে অনাগ্রহ সংক্রান্ত একটি মিথ প্রচলিত রয়েছে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে। বয়োজ্যেষ্ঠ দীলিপ তঞ্চঙ্গ্যা[১] জানান 'আগের মানুষ গুলি মনে করতো, লেখাপড়া শিখলে ব্রিটিশরা তাদের ছেলেপেলেদের নিয়ে চাকরি দিয়ে দিবে। এই জন্য কৃষি কাজে এরা সময় দিতে পারবে না। তাই বাবা-মা মনে করতো পড়ালেখা না শেখানোই ভালো'। তিনি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন 'কিন্তু বাপ-মা এখন দেখতে পারছে, পড়ালেখা শিখলে চাকরি পাওয়া যাচ্ছে, আর চাকরিজীবীরা ভালোভাবে ঘর-সংসার চালাচ্ছে। এজন্য এখন ছেলে মেয়েদের কে পড়ালেখা শেখানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। আর এজন্য দিন দিন আমাদের মধ্যে বি.এ. বা মেট্রিক পাশ লোকের সংখ্যা বাড়ছে'। এ ব্যাখ্যা থেকে বলা যায়, তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রথাগত পেশা নির্ভর অতীতের যে জীবন প্রণালী তা অনেকাংশে বদলে গেছে। এটি প্রতীয়মান হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, জীবন পদ্ধতির এ পরিবর্তনশীলতা তাদেরকে শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে।

উপস্থিত কালের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে অনেকে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে উচ্চতর পেশায়ও আসীন হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মেডিকেল কলেজে বি.এ., বি.এস.সি., বি.এস.এস., বি.কম. (অনার্স ও পাশ), বি.এড., এম.এ., এম.এস.এস., এল.এল.বি., এম.বি.বি.এস. প্রভৃতি ডিগ্রীসহ পলিটেকনিক্যাল ইনিস্টিটিউট এবং কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা কোর্সে অনেক তঞ্চঙ্গ্যা শিক্ষাগ্রহণ করছে এবং শিক্ষা সমাপ্ত করে অনেকেই বিভিন্ন পেশায় কর্মরত রয়েছেন (তঞ্চঙ্গ্যা ১৯৯৫)। ইদানীং অবশ্য আরও বেশী সংখ্যক তঞ্চঙ্গ্যা দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত রয়েছে।

অন্যদিকে আমার গবেষণার আওতাধীন এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠ তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনায় আনলে দেখা যায় তাদের শিক্ষার হার নিতান্তই কম। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে সাতকমল পাড়ায় মাধ্যমিক পর্যায় উত্তীর্ণ কোন তঞ্চঙ্গ্যা ব্যক্তি ছিলো না। গ্রামে সর্বপ্রথম মাধ্যমিক পাশের ঘটনা ঘটে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এবং ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এ সংখ্যা ছিল মাত্র চার জন। তবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে শিক্ষা

[১]এ প্রবন্ধে তথ্যদাতাদের ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

গ্রহণের প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিতামাতার প্রজন্মের মধ্যে নিরক্ষর থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা জানা লোকের সংখ্যা বেশী হলেও বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি. উত্তীর্ণ বা সমপর্যায়ে অধ্যয়নরতদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। সার্বিকভাবে বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত উত্তীর্ণের হার মোট তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে মাত্র ১৭% আগে তা ছিল ১-২% এর মতো। শিক্ষাগ্রহণ এবং এর বিনিয়োগ তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে পেশাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন ধারা বলা যেতে পারে।

## সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রসরতা: পরিবর্তনের নতুন ধারা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক সচেতনতার বীজ বপন করছে যার ফলে তারা নানা ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে যা পূর্বে তাদের মধ্যে দেখা যেত না। এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

### খেংখ্যং শিল্পীগোষ্ঠী:

১৯৯৩ সালে 'খেংখ্যং শিল্পীগোষ্ঠী' নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়, যা মূলত তঞ্চঙ্গ্যা নৃত্য, সঙ্গীত, নাটকসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান নিয়ে কাজ করে থাকে। খেংখ্যং হচ্ছে এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র যা মুখ দিয়ে বাজাতে হয়, অধুনা বিলুপ্ত প্রায় এ বাদ্য যন্ত্রের নামানুসারে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছড়িয়ে দেয়া ও এর ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করে থাকে। খেংখ্যং শিল্পীগোষ্ঠী নানা পরিবেশনার মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যাদের যাযাবর জীবন, প্রেম-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত লোককাহিনী, শিকার, জুমচাষ কেন্দ্রিক জীবন প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী বিষয়াবলী তুলে ধরে। তবে এক্ষেত্রে জুমচাষকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে উপস্থাপন করলেও বর্তমানে এর সাথে তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পৃক্ততা সীমিত বরঞ্চ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

### সমমনা পরিষদ:

সাতকমল পাড়ার চাকুরিজীবীদের সমন্বয়ে সমমনা পরিষদ গঠিত হয়, যার মাধ্যমে মূলত সদস্যগণের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে টাকা সঞ্চয় করা হয়। সঞ্চিত পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ এবং প্রাথমিক প্রকল্পসমূহ সফল হলে গ্রামের উন্নয়নের জন্য কাজ করার মানসিকতা পোষণ করে পরিষদটি। সমমনা পরিষদের গঠন ও কার্যপ্রণালী তঞ্চঙ্গ্যাদের পেশাগত বৈচিত্র্যের পাশাপাশি তাদের মধ্যকার পেশাভিত্তিক ঐক্যকেও নির্দেশ করে।

### প্রত্যাশা বহুমুখী সমবায় সমিতি:

২০০৭ সালে গ্রামের সকল পরিবারের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গঠিত হয় প্রত্যাশা বহুমুখী সমবায় সমিতি। এতে প্রত্যেক পরিবার মাসিক পঞ্চাশ টাকা হারে সঞ্চয় জমা করে। সঞ্চিত টাকার পরিমাণ বেশী হলে সবার সম্মতিতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন, মৎস্যচাষ, শূকর পালন, প্রভৃতি প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। গ্রামের অধিবাসীরা মূলত তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন তথা উপার্জন বৃদ্ধি কল্পে এ সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে গ্রামের সকল স্তরের মানুষের মধ্যকার একতা যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি এর মাধ্যমে তাদের আরো বিচিত্র পেশায় যুক্ত হবার অধিক সম্ভাবনাও পরিলক্ষিত হয়।

### পঞ্চবুদ্ধ অনাথালয়:

সাতকমল পাড়ায় পঞ্চবুদ্ধ অনাথালয় নামক একটি অনাথাশ্রম রয়েছে, যা ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র পাহাড়ি শিক্ষার্থীরা তাদের গ্রামে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না থাকায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

অর্জনের জন্য এই অনাথালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। গ্রামের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনাথালয়টি পরিচালিত হয়। গ্রামবাসী তাদের সামর্থ অনুযায়ী নগদ টাকা, চাল, ডাল, সবজি, মাছ-মাংসসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান দেয়। গ্রামের মানুষের এ সচেতন ও সম্মিলিত উদ্যোগের ফলে তঞ্চঙ্গ্যাসহ অন্যান্য পাহাড়ি সম্প্রদায়ের দরিদ্র শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে এবং পরবর্তীতে অর্জিত শিক্ষা বিনিয়োগের মাধ্যমে নানা পেশায় নিয়োজিত হবার সম্ভাবনাও তৈরী হচ্ছে।

## কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া

তঞ্চঙ্গ্যারা দাবি করে তাদের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল জুম চাষ কিন্তু বর্তমানে তাদের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। চাকুরি, ব্যবসা বা অন্যান্য পেশার সাথে কিছু পরিবার যুক্ত থাকলেও কৃষির সাথে তাদের অধিকতর সম্পৃক্ততা রয়েছে। সাতকমল পাড়ার সবগুলো পরিবারেরই কৃষির সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে, তবে কিছু পরিবারে চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী বা অন্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি রয়েছে।

বর্তমানে গ্রামের কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাওয়ারটিলার, পাম্প মেশিনের ব্যবহারের ফলে সনাতন কৃষি পদ্ধিতিতে লেগেছে পরিবর্তনশীলতার ছোঁয়া। এ গ্রামের তঞ্চঙ্গ্যারা মনে করে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার তাদের উৎপাদন অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। জমি চাষাবাদ ও পানি সেচের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহারের পাশাপাশি তঞ্চঙ্গ্যা কৃষকরা ফসল রোপণের ক্ষেত্রেও বর্তমানে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে। উন্নত জাতের ধান যেমন, বি.আর.-১১, বি.আর.-২৮, ছাড়াও শিম, লাউ, পেঁপে, বরবটি, আদা, হলুদ, বেগুন প্রভৃতি চাষাবাদের ক্ষেত্রেও তারা উন্নত জাতের বীজ বা উপকরণ ব্যবহার করে। কৃষকরা আরো জানায় হাইব্রিড জাতের নতুন ধান রোপণ করে তারা অনেক ভালো ফলন পেয়েছে।

পাশাপাশি, গ্রামে 'আই.পি.এম. কৃষক ক্লাব' এবং 'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র' স্থাপিত হওয়ায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে আধুনিক কৃষি উপকরণ গ্রহণে উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান, বেকারত্ব দূরীকরণে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষসহ নানবিধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অনুপ্রেরণা যোগানো সম্ভব হচ্ছে। এ কেন্দ্রগুলো বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ইন্টারনেটের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান যেমন, কৃষি যন্ত্রপাতির বাজার মূল্য, ভেজাল মুক্ত সার ও ভালো বীজ চেনার সহজ উপায় এবং আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে অভিহিত করাসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করছে।

পরিবর্তনশীল এই ধারায় বর্তমানে সাতকমল পাড়ার জমিতে উৎপন্ন ফসল বিপণন করতে কৃষকদের তেমন বেগ পেতে হয়না। উৎপাদিত শস্য ক্রয় করতে এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম হতে সওদাগর (ক্রেতা) তাদের গ্রামে আসে। এ সওদাগরেরা ফসল দেখে এর মূল্য নির্ধারণ ও নেওয়ার দিন ধার্য করে যায়, পরবর্তীতে নির্ধারিত দিনে ট্রাক নিয়ে এসে পণ্য নিয়ে যায়। সর্বোপরি বলা যেতে পারে, ঐতিহ্যবাহী জুমচাষের ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদ এবং বাজার ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ততা- তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের অভ্যন্তরীন পরিবর্তনশীলতাই নির্দেশ করে যা তাদের পেশার ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হচ্ছে।

## পেশাগত পরিবর্তনশীলতা

যদিও তঞ্চঙ্গ্যারা দাবী করে পূর্বে তাদের সবাই জুমচাষী ছিলো কিন্তু বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশই কৃষির সাথে যুক্ত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে তারা কৃষি ছাড়াও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি, ব্যবসা, শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, নার্সিং, ড্রাইভিং, আইনজীবী, বেদ্যসহ নানাবিধ পেশায় যুক্ত রয়েছে। সাতকমল পাড়ার তঞ্চঙ্গ্যারা মূলত কৃষি, ব্যবসা, চাকুরি, শিক্ষাদান ও গ্রহণ, রিকশাচালনা, দিনমজুরী, গৃহ কর্ম প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত।

সাতকমল পাড়ার প্রায় সব বাড়িতেই বেইন (কোমর তাঁত) এর মাধ্যমে মেয়েদের পোশাক, যেমন পিনুইন, খারি (ওড়না) এবং কম্বল তৈরী করা হয়। তবে এখন কিছু পরিবারে সেলাই মেশিনের ব্যবহার হচ্ছে। তাঁত এর পরিবর্তে সেলাই মেশিনের ব্যবহার তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে পেশা পরিবর্তনশীলতার তথা আধুনিকতার ছোঁয়া হিসাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সাতকমল পাড়ায় মোট চব্বিশটি গবেষণাধীন পরিবারের মধ্যে বিশ জন কৃষক, নয় জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী, পনেরো জন সরকারী ও বেসরকারী চাকুরিজীবী, ছেচল্লিশ জন শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য পেশার লোক ছিল, তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ একই সাথে একাধিক পেশা যেমন- কৃষি, ব্যবসা, দিন মজুর, কাঠমিস্ত্রী প্রভৃতির সাথে যুক্ত। নিম্নে কয়েকটি কেইস স্টাডির মাধ্যমে সাতকমল পাড়ার তঞ্চঙ্গ্যাদের পেশাগত বৈচিত্র্য তুলে ধরা হলো।

**কেস ১**

অলক কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, বয়স ৫১ বছর। তিনি একাধারে কৃষক, ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি। তার ৬ একর প্রথম শ্রেণীর (ধান চাষের উপযোগী সমতল ভূমি), ৩ একর দ্বিতীয় শ্রেণীর (সবজি চাষের উপযোগী কিছুটা উঁচু ভূমি) এবং ২০ একর ৩য় শ্রেণীর (পাহাড়) জমি রয়েছে। তাঁর নিজস্ব পাওয়ারটিলার ও পাম্প মেশিন রয়েছে, তিনি নিজে তার কৃষি কাজ দেখাশোনা করেন। এছাড়া তিনি নির্মাণ ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত, বান্দরবানে বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তা, ব্রীজসহ বিভিন্ন ধরনের যে নির্মাণ বা মেরামত প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়া হয়, তা তিনি কন্ট্রাকের বিনিময়ে সম্পাদন করে থাকেন। তার একটি শূকরের খামার রয়েছে এতে ২৫টি শূকর রয়েছে, তিনি নিজেই এর তত্ত্বাবধান করেন। আবার তিনি জন প্রতিনিধি হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে সমাজ সেবামূলক কাজও করেন।

**কেস ২**

অমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, বয়স ৩৭। তিনি একজন কৃষক। তার চাষাবাদের জন্য নিজস্ব কোন জমি নেই, গ্রামের প্রভাবশালী এক জনের নিকট হতে তিনি ৬ একর পাহাড় বর্গা নিয়ে তাতে সেগুনের বাগান করেছেন। তাছাড়া তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিও বর্গা নিয়ে ধান ও সবজী জাতীয় ফসলের চাষাবাদ করেন। তার স্ত্রী গৃহের কাজের পাশাপাশি কৃষিতে সময় দেন এবং বাড়িতে নিজের পরিধানের জন্য পিনুইন, খারি প্রভৃতি তৈরী করেন। যখন কৃষি কাজ থাকেনা তখন অমল তঞ্চঙ্গ্যা ঘর মেরামত ও কাঠের আসবাবপত্র তৈরীর কাজ করেন। তিনি আবার সাতকমল পাড়ার খেংখ্যং শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম কুশিলব। খেংখ্যং শিল্পীগোষ্ঠীর হয়ে তিনি অভিনয় করে থকেন, বান্দরবানসহ বিভিন্ন জায়গায় খেংখ্যং শিল্পীগোষ্ঠীর সাথে পরিবেশনায় অংশ নেন। উপরোক্ত বর্ণনায় এটা স্পষ্ট যে সাতকমল পাড়ার তঞ্চঙ্গ্যার নানাবিধ পেশায় নিযুক্ত রয়েছে, তবে সবারই কৃষির সাথে যোগসূত্র রয়েছে।

## এন.জি.ও. কার্যক্রম

সাতকমল পাড়ায় বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ভিশন, কারিতাস, আশা, ব্র্যাক, গ্রাউস, গ্রামীণ ব্যাংকসহ নানা এন.জি.ও. এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এদের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ভিশন শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করে থাকে। বিশেষত শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের যে স্পন্সর প্রকল্পটি রয়েছে তার মাধ্যমে কোন পরিবারের একজন শিক্ষার্থীকে (ছেলে বা মেয়ে) স্পন্সর করা হয়। এর আওতায় তার লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ বহন করা হয়। এতে করে পরিবারের স্পন্সর প্রাপ্ত সদস্য পড়ালেখা শেষ করে চাকুরিতে যোগদান করে তার পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করতে পারছে।

গ্রামে ব্র্যাক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি কিশোরী ক্লাব রয়েছে, এর মাধ্যমে গ্রামের কিশোরীদেরকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়। তবে ব্র্যাক, আশা ও গ্রামীণ ব্যাংক এর কার্যক্রম মূলত ক্ষুদ্রঋণ ভিত্তিক, সাধারণত গ্রামের অস্বচ্ছল মানুষেরা এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। জামানতের প্রয়োজন হয় না এবং হাতের কাছেই এই সকল প্রতিষ্ঠানকে পাওয়া যায় বলে তুলনামূলকভাবে দরিদ্র তঞ্চঙ্গ্যারা এ ধরণের প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ নেয়। তবে এসকল প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ঋণের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। একজন ঋণ গ্রহীতা সুজা তঞ্চঙ্গ্যার অভিমত "ঋণ নিলে সাত দিন পরেই কিস্তির টাকা দিতে হয়। এজন্য টাকাটা খাটানোর সময় না পাওয়ায় আমাদের ক্ষতি হয়"। গ্রামের চেয়ারম্যান এসকল প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদের হারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "ঋণ নিলে দেখা যায় প্রায় ১৫% এর মতো সুদ দিতে হচ্ছে কিন্তু অন্যদিকে সরকারী কৃষি ব্যাংক ২% সুদে লোন দিচ্ছে। কিন্তু তবুও মানুষ এই এন.জি.ও. গুলো থেকে ঋণ সুবিধা নিচ্ছে। এদের কে হাতের কাছে পাওয়া যায় বলে ক্ষতি জেনেও মানুষ ব্যাংক এ না গিয়ে এন.জি.ও. গুলোর কাছেই ঋণ নেওয়ার জন্য যাচ্ছে"। তাছাড়া একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন এন.জি.ও. এর সাথে সম্পৃক্ত থাকায় সহজেই তারা তাদের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ঋণ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। গবেষণা এলাকায় যে সকল এন.জি.ও. এর কার্যক্রম রয়েছে তাদের ৮০% ই ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে কাজ করে থাকে। তবে এটা সত্য যে, গ্রামে এন.জি.ও. কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রাত্যহিক জীবনে রাজনৈতিক সংযুক্ততার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষণীয়, যে সকল তঞ্চঙ্গ্যা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত পরবর্তীতে তারা চাকুরি, ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অন্যদের চাইতে বেশী সুবিধা লাভ করে। বিশেষত যে রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকে সরকারি বা বেসরকারি চাকুরি লাভ, চাকুরিতে পদোন্নতি এবং ব্যবসা, বিশেষ করে ঠিকাদারী কাজ পাবার ক্ষেত্রে ঐ দলের সাথে সম্পৃক্ত তঞ্চঙ্গ্যারা অধিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়।

## উপসংহার

নিবন্ধটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের পেশাগত পরিবর্তন ও গতিশীলতার স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষা, জুমচাষের উপযোগী জমি ও উৎপাদন কমে যাওয়ার মতো ঘটনাগুলো তাদের পেশা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মূল বিষয় হিসেবে কাজ করছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্রমান্বয়ে যে পরিবর্তন হচ্ছে তার ছোঁয়া লাগছে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়েও। চুক্তি পরবর্তী সময়ে অধিক সংখ্যক পাহাড়ি শিক্ষা, ব্যবসা, চাকুরি, চিকিৎসাসহ নানা প্রয়োজনে চট্টগ্রাম বা ঢাকামুখী হতে থাকে। তাছাড়া পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এখানে জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং তঞ্চঙ্গ্যা ও অন্যান্য পাহাড়ি সম্প্রদায় অধিক হারে জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হতে থাকে। ফলে তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও গতিশীলতা সূচিত হয়। বর্তমানে তারা কৃষি ছাড়াও নানাবিধ পেশায় যুক্ত। পেশাগত এ পরিবর্তনশীলতা নানাভাবে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজেও পরিবর্তন সংঘটিত করছে।

মূলত পেশাগত পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটেছে, জুম নির্ভর যাযাবর জীবন থেকে তারা স্থায়ীভাবে বসবাসে অভ্যস্থ হচ্ছে। তাছাড়া বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রভাবে তারা শিক্ষা, চাকুরি, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, বিনোদনের মত বিষয়গুলোকে অনেক বেশী প্রাধান্য দিচ্ছে। জুমচাষ এখন তাদের ঐতিহ্যের একটি 'সাংস্কৃতিক প্রতীক'- এ পরিণত হয়েছে। বর্তমান শিক্ষার হার, রাজনৈতিক সচেতনতা ও তাতে অংশগ্রহণ, পেশাগত বৈচিত্র্যসহ নানা দিক বিবেচনা করে বলা যায় তঞ্চঙ্গ্যাদের এ-ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশে তারা একটি অগ্রগামী জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবে।

**তথ্য নির্দেশিকা:**

আহামেদ, ফরিদ উদ্দিন (২০১২)। *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা। ভাষা ও ভাষা-প্রসঙ্গ।* ঢাকা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনিস্টিটিউট।

খান, আব্দুল মাবুদ (২০০৭)। *বান্দরবান জেলার মারমা সম্প্রদায়*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

তঞ্চঙ্গ্যা, শ্রী বীরকুমার (১৯৯৫)। *তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি*। রাঙ্গামাটি: তঞ্চঙ্গ্যা মহাসম্মেলন উদযাপন কমিটি।

Ahamed, F. U. (2006). Culture Becomes Politics, Politics Becomes Culture: Language and Identity in the CHT. In Islam, Z. & Shafie, H. (eds.) *Anthropology on the Move: Contextualizing Culture Studies in Bangladesh*. Dhaka: Dhaka University Press.

Bessainet, P. (1958). *Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts*. Dhaka: Asiatic Society of Pakistan.

Devnath, R. (2008). *Ethnographic Study of Tanchangya of CHT, CADC, Sittwe and South Tripura.* Kolkata: Kreative Mind.

Dressler, D. (1969). *Sociology: The Study of Human Interaction*. Toronto: Random House of Canada Limited.

Lewin, T. H. (1869). *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein.* Calcutta: Bengal Publishing Company.

Mohsin, A. (1997). *The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts Bangladesh.* Dhaka: The University Press.

Sattar, A. (1983). *In The Sylvan Shadows*. Dhaka: Bangla Academy.

Shelley, M. R. (1992). *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Untold Story.* Dhaka: Center for Development Research.

Sorokin, P. (1964). *Social and Cultural Mobility.* New York: The Free Press.

Tsing, A. (1998). *In the Realm of the Diamond queen: Marginality in an Out-of-the Way Place*. Princeton: Princeton University Press.